প্রস্তাবনা

আজকের এপার-ওপার বাংলা একদা ছিল সুপ্রাচীন পুন্ড্র -বরেন্দ্রভূম-গৌড়, অর্থাৎ প্রাচীন করতোয়া-মহানন্দা নদীর মধ্যবর্তী ও সন্নিহিত অঞ্চল; সুক্ষ্ম অর্থাৎ দক্ষিণ রাঢ়, তাম্রলিপ্ত (তমলুক) প্রভৃতি অঞ্চল; সমতট অর্থাৎ ঢাকা থেকে সমুদ্রতট পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগ; রাঢ় অর্থাৎ গৌড়ের পশ্চিমে সাঁওতাল পরগণা পর্যন্ত অজয়-দামোদর বিধৌত অঞ্চল এবং বঙ্গ অর্থাৎ প্রচীন ভাগীরথীর উভয় তীরবর্তী অঞ্চল। এপার-ওপার বাংলার এই ভূ-ভাগ সুপ্রাচীন যুগ থেকে বারবার প্রসারিত-সঙ্কুচিত হতে হতে অন্ত্যলগ্ন বিশ শতক পেরিয়ে একুশ শতকের প্রথম দশক অতিক্রম করেছে। অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকের বাংলা কবিতায় সেইসব কবিদের কথা উঠে এসেছে যাঁরা এই বিশেষ অঞ্চলের লোক-ঐতিহ্যের প্রেক্ষাপটে বিশিষ্ট আত্মস্বাতন্ত্র্যবাদী পরিক্রমায় আন্তরিক ছিলেন।

দশক ওয়ারি মানচিত্রে বহু বর্ণময় ও বহুমাত্রিক বিশ শতকের শেষ তিন দশক। যৌবন তাড়িত বছরগুলিতে অনেক কবিকেই দেখি নাগরিক জীবনের বিপন্নতার মধ্যে ঘুরপাক খেতে। অনেক কবিই সে সময় প্রতিকারহীন বেঁচে থাকার বেদনায় ও উদাসীনতায় স্বর্গের সন্ধান করেছিলেন লোক-জীবন স্রোতে। লোক সংস্কৃতির বীক্ষণ-পর্যবেক্ষণে জীবনের প্রতি আস্থা ফিরে পাবার ইশারাই শুধু নয়, তাঁদের কবিতায় প্রকটিত হয়েছে জীবন বিষয়ক সত্য ভাষণ -

'আমার ভুলগুলো আজ পরিষ্কার ভাবে
বুঝতে পারি আমি
সন্ধেবেলা হাঁটতে হাঁটতে ঐ বাড়ি ফিরে চলেছে মানুষ।
শুকনো গাছটায়
দেখি আবার যাতায়াত শুরু করেছে পাখিরা।
শোনো, সমস্ত কিছুই নষ্ট হয়নি
সমস্ত কিছুই শেষ হয়ে যায়নি আমাদের।'

(শ্রেষ্ঠ কবিতা/'পুরোনো কাগজের মালা'-ভাস্কর চক্রবর্তী।)

লোকজীবন প্রেক্ষিত এ সমাজের অনেক কবিকে দিয়েছে দিশা, জীবনে নতুন স্বপ্ন দেখার অভিলাষ।

আর একটি কথা। তাত্ত্বিক আলোচনার প্রেক্ষাপটেই আমি অধ্যায় ভাগ করেছি। কিন্

তার অর্থ এই নয় যে ঐ অধ্যায় ছাড়া অন্য অধ্যায়ে ঐভাব-ভাবনার বিষয় মেলে না। যদিও সাল-শকাব্দ অনুযায়ী কবিতার আলোচনা অবৈজ্ঞানিক নয়, তথাপি বিষয় অনুযায়ী বক্তব্যের উপস্থাপনায় ইতিহাস ধর্মী কাজের অসুবিধা অনেক পরিমাণে দূর হয়। ব্যাপারটি অধিক বিজ্ঞান সম্মত বলে আমি মনে করি। গবেষণার স্বার্থে, তত্ত্বের স্বার্থে কবিতার ক্ষেত্রে দশক বিভাজন করা যেতেই পারে।

'অন্ত্যলগ্ন বিশ শতক'-এর মধ্যে দশক বিভাজনের ব্যাপারটি রয়ে গেছে। দশক বিভাজন সর্বদাই উচিৎ বলে আমার প্রত্যয়। দশক-ওয়ারী বিভাজনই একমাত্র সম্মানীয় উচ্চারণ। উপমার আলোকে বলা যায়, এক একটি দশক এক একটি সুদৃশ্য জানালা, জানালার ফাঁক দিয়ে এক একটি খণ্ড ও নিকটবর্তী ল্যান্ডস্কেপ, যেখানে কবিতার সোনার হরিণ এসে ঘাস খায়।

পূববর্তী দশকগুলোর তুলনায় অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকের কয়েকটি দশকের কবিতা অনেক বেশি ঠাসা কম্পোজড্ ও দৃঢ়পিনদ্ধ।

আরও একটি কথা। সুনির্দিষ্ট ভাবে কোন্ সময় থেকে একজন কবি তাঁর কবিতা যাপন শুরু করেছেন — এই সূত্রে কবিতার দশক বিভাজন জরুরী।

কবিতা যুগের সঙ্গে অন্বিত। সর্বকালের সমন্বয়ে মহাকালের যে গতি তাতে কবিতাকে যুগ বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত না করলে অনন্তকাল ব্যাপী কবিতার যুগ-অভিধা চিহ্নিত অথবা সনাক্ত করণের ব্যাপারটি অসম্ভব হয়ে পড়ে। এই কারণেই বিশেষ বিশেষ যুগের কবিতা আলোচনার ক্ষেত্রে কবিদের নির্বাচনের বিষয়ে সংযোজন-বিয়োজনের ব্যাপারটি এসে পড়ে। কিছু কবিকে বেছে নিতে হয়, বাদ দিতে হয় অনেক কবিকেই। আসলে আলোচনার জন্য 'হাত পা বেঁধে দেওয়া।'

আলোচ্য গবেষণা গ্রন্থে আমার বক্তব্য বিষয়কে আমি মোট সাতটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করেছি। প্রথম অধ্যায়ে অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকে সময়ের স্বর ও স্বরান্তর। দ্বিতীয় অধ্যায়ে লোক ঐতিহ্যের প্রেক্ষাপট। তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচ্য সময়ের কবিতায় কবি-মানস, লোক-মানস ও লোক-বীক্ষা। পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকের বাঙালি কবিগোষ্ঠীর লোকজীবন প্রেক্ষিত-আশ্রিত ভাবনা। সপ্তম অধ্যায়ে আলোচ্য কবিদের কবিতায় ব্যবহৃত লোকভাষা ও চিত্রকল্প।

কবিতায় যে সমাজ মানসিকতার মর্মস্পন্দন অনুভূত হয় তাকে আলোচনার সীমায় এনেই শুধু আলোচকেরা ক্ষান্ত থাকেন নি, সেই আলোচনা ক্রম প্রসারিত হয়েছে প্রাবন্ধিকের সংযোজনায়। কবিতা বিষয়ক আলোচনায় আলোচ্য গ্রন্থটিও একটি সংযোজনা। এই গ্রন্থের সাত অধ্যায়ে যে কবিরা তালিকায়িত হয়েছেন তাঁরা প্রত্যেকেই 'আধুনিক'। কিন্তু যে সব কবি অনিচ্ছাকৃত ভাবে আলোচনার বাইরে রয়ে গেলেন, বলা বাহুল্য, বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধ ইতিহাস-ভাণ্ডারে তাঁদের স্থান অনস্বীকার্য। আমি কখনোই মনে করি না, সৃষ্টির যা কিছু বড় ও ভালো শুধু তাই নিয়েই ইতিহাসের পথ চলা। সৃষ্টির ভালোমন্দ, বড়-ছোট, সব কিছু নিয়েই ইতিহাস। গবেষণা-গ্রন্থের সীমিত পরিসরে কারও স্থান হোক বা না হোক, অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকের বাংলা কবিতার আলোচনাকে লোক-জীবন প্রেক্ষিতে আমি সাম্ভাব্য বিস্তৃতি দেবার চেষ্টা করেছি। আর সেই কারণেই বাংলাদেশের কতিপয় বিশিষ্ট কবির কবিতা আলোচ্য গবেষণা-গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করেছি। বাংলা কবিতার প্রধান একটি ধারার চর্চা সেখানে চলছে। রাজনীতি, ধর্ম ও আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের কারণে বাংলা কবিতার চেহারা সেখানে একটু আলাদা। ভাষাতেও পার্থক্য আছে।

বিষয় বিন্যাস ও প্রাকল্পিক বৈচিত্র্যের কথা মনে রেখে আলোচ্য গ্রন্থে এপার-ওপার বাংলার কবিদের নিয়ে আলোচনাকে আমি পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিন্যস্ত করেছি। এর অর্থ এই নয় যে প্রকল্পের অন্যান্য অধ্যায়গুলিতে অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকের বাংলা কবিদের কথা অনালোচিত থেকে গেছে। কয়েকজন কবিকে ষষ্ঠ অধ্যায়ে (অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকের বাংলা কবিতায় লোকজীবন প্রেক্ষিত) স্থান দেবার মূল কারণ – আলোচ্য যুগের বাংলা কবিতায় লোকজীবন প্রেক্ষিতে কবি-মানস ছায়া ফেলে দাঁড়িয়ে আছে। শুধু তাই নয়, কবিদের লোক-বোধ আবৃত্ত হয়েছে জীবনের স্বাদু প্রত্যাশায়। কবির লোক-ভাবনা যখন লোক-জীবন প্রেক্ষিতকে বাদ দিয়ে নয়, তখন ষষ্ঠ অধ্যায়ে কিছু কবির প্রাসঙ্গিক আলোচনা আমার কাছে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে যেসব কবির লোকভাবনা ও মনোগতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে তাঁদের কয়েকজন হলেন- আল মাহমুদ, শঙ্খ ঘোষ, অমিতাভ দাশগুপ্ত, নীরেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী, সুনীল গঙ্গেপাধ্যায়, জয় গোস্বামী, অরুণ মিত্র, অলোক রঞ্জন দাশগুপ্ত, তসলিমা নাসরিন, শ্রীজাত, কৃষ্ণা বসু, সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, রত্নেশ্বর হাজরা, অরুণ চট্টোপাধ্যায়, রাম বসু, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ভূমেন্দ্র গুহ।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'কবিতার সুখ-দুঃখ' শীর্ষক আলোচনায় বলেছেন, 'সাহিত্যের সবগুলি শাখার মধ্যে অপাঠ্যতম বিষয় হচ্ছে কবিতা বিষয়ক রচনাগুলি। কবিতা যেহেতু ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের অতীত, সেজন্যই এই দুর্বলতা ঢাকার প্রয়াসে এই সব রচনা দুর্বোধ্য ও খটমটে, কৃত্রিম, গালভরা শব্দে কন্টকিত। অধিকাংশ রচনাই বুদ্ধির ব্যায়াম অথবা একটা আপাত দার্শনিকতা খোঁজার চেষ্টা। কবিতার পবিত্রতা কবিতার ব্যাখ্যায় ঝলসে যায়।' (শুধু কবিতার / ত্রয়োদশবর্ষ/১ম সংখ্যা/ আশ্বিন, ১৪১৩ থেকে সংগৃহীত)।

আমিও বিশ্বাস করি, কবিতা বহিরঙ্গ আলোচনার বিষয়বস্তু নয়, অন্তরঙ্গ উপলব্ধির ব্যাপার। সেই উপলব্ধিকে ব্যাখ্যা করতে, বিশ্লেষণ করতে আমি দোষ দেখিনা। আর সেই কারণেই কাব্য-পাঠ প্রতিক্রিয়ার কথা প্রকাশের চেষ্টাকে 'অপাঠ্যতম বিষয়' বলতে আমার বাধে। আমার এই গবেষণার সিংহভাগ জুড়ে রয়েছে কাব্য-পাঠ প্রতিক্রিয়ার কথা প্রকাশের চেষ্টা।

সৃজনধর্মী সাহিত্য-শিল্পের আলোচনায় 'রিসার্চ' আর 'ক্রিটিসিজম' শব্দ দুটির ততটা গুণগত পার্থক্য নেই, যতটা শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থে আছে। কাজেই এখানে 'গবেষণা' বলতে 'কাব্য-সমালোচনা' অর্থটিই গ্রহণ করা শ্রেয় বলে আমার মনে হয়।

উনিশশো সত্তর, আশি ও নব্বই – এই তিন দশকের কবিরাই হলেন অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকের কবি। যাঁরা সত্তর থেকে লিখতে শুরু করেছেন তাঁরা সত্তরের কবি – এ নিয়ে মতান্তর না থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু কোনো এক বিশেষ দশকের কবিতা বলে চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে যে গন্ডগোল তা আজও অমীমাংসিত রয়ে গেছে। কবি ও কবিতাকে দশকের খোপে এঁটে বিচার করা যতটা গবেষকের পক্ষে সুবিধাজনক ততটা কবিদের পক্ষে উৎসাহব্যঞ্জক নয়। একটা বিশেষ দশকের কবিতা বলতে শুধু যাঁদের লেখা ঐ সময়ে আরম্ভ হল তাঁরাই নন, যাঁরা ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠিত এবং যাঁদের লেখালেখি ধারাবাহিক ভাবে চলছে-তাঁদের কবিতাও বোঝায়। এই কারণেই অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকের কবি ও কবিতা প্রসঙ্গে প্রাক-সত্তরের কবি ও কবিতাকে অভিন্ন তাৎপর্যে আমি গ্রহণ করেছি। তাই ষাটের কবিদের ব্যর্থ নমস্কারে ফিরিয়ে দিতে পারিনি। কারণ এই সীমান্তবর্তী কবিরা সময়াঙ্কের ঋজুপথেই পদচারণা করেছেন।

অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকের সাতের দশক প্রকৃত অর্থেই বাংলা কবিতার একটা বড়ো বাঁক।

ত্রিশ পঞ্চাশ এবং সত্তর সালও বিশ শতকের তিনটি উল্লেখযোগ্য বাঁক। কবিতার নির্মাণ, সৃষ্টি ও নতুন হয়ে ওঠা এবং নতুন কবিস্বর ধ্বনিত হওয়ার কারণেই এই তিন দশক অন্যসব দশককে অবলীলায় পিছনে ফেলে দিতে পেরেছে। আবার অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকের তিনটি দশক — সত্তর-আশি-নব্বই শুধু রাজনৈতিক ঘটনাবর্তে সঙ্কুল নয়, পরস্পর বিরোধী নানা বর্ণ প্রলেপে এই সময় রংমশালের মতো জ্বলেছে। ক্রোধে ও কামনায়, বিষাদে এবং বিশ্বাসে, জিজ্ঞাসা ও যন্ত্রণায়, বিদ্রূপে এবং বিপন্নতায়, অঙ্গীকারে ও অনিচ্ছায়, নিষ্ঠায় ও আত্মত্যাগে এই দশকত্রয় বৈচিত্রমন্ডিত হয়েছে।

এই সময়ের কবিতায় যে কালের মন্দিরা বেজেছিল তাঁর ধ্বনি আবেগী ছিলনা বলা বাহুল্য। এই সময়ের বাংলা কবিতার অন্তরে বাইরে যে বৈচিত্র্য-তা-থেকে একটিকে বেছে নিয়েছি আমি-'লোক ঐতিহ্যের প্রেক্ষাপট।' সমগ্র বক্তব্য বিষয়কে আমি মোট সাতটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করেছি। প্রথমটির নাম দিয়েছি 'বিশ শতকের অন্ত্যলগ্ন ঃ সময়ের স্বর ও স্বরান্তর'। এই সময়-পর্বের কবিতায় দেখি বিচ্ছিন্নতা থেকে মুক্তির আকুল আকাঙ্খার কথা, নিঃস্ব মানুষের ক্লান্তি আর ছিন্নমূল প্রাণের উৎসমূলে নিঃসঙ্গ মানুষের যন্ত্রণা থেকে মুক্তির অভিলাষে অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকের কবিরা প্রায়ই অবগাহন করেন সংঘশক্তির অর্ণবে, তুলে আনেন সেখান থেকে প্রবহমানতা আর প্রত্যয় ও প্রত্যাশার অফুরান শক্তি- উৎস। এই স্বর থেকেই স্বরান্তরে প্রস্থান — উনিশশো সত্তর থেকে আশি, আশি থেকে নব্বই, নব্বই থেকে নব শতক। এই তিন দশকের কবিদের অনেকেই দেখছেন একবিংশের আলো। তাঁরা অনেককে দিয়ে লিখিয়ে নিচ্ছেন বিশ শতকের শেষ তিন দশকের স্বরলিপি ও সোনাটা। সময়ের স্বরান্তরে পৌঁছেও অনেক পাঠক-সমালোচক ঘুরে ফিরে আসছেন সত্তর-আশি-নব্বইয়ের চোরাটানে। সেই সময়ের কবিরা এমন গুপ্তধন রেখে গেছেন সময়ের এক শিলা পাথরের নিচে, সময়ের স্বরান্তরে এই শতকের দক্ষ নাবিক লেখালেখির দরিয়ায় ভাসতে ভাসতে ধাক্কা খাচ্ছেন সেই পাথরে; দেখছেন, বিশ শতকের শেষ দশকত্রয় তাদের কবিতা সমেত শুয়ে আছে মরা মুহূর্তের তলে ডুবে থাকা টাইটানিকের মতো। আজ, সময়ের স্বরান্তরে শুরু হয়েছে আর এক উদ্ধারপর্ব।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের নাম 'লোক ঐতিহ্যের প্রেক্ষাপট ঃ প্রধান বৈশিষ্ট্য'। সাধারণ মানুষ জীবনের পথে হাঁটে বেশ কিছু বিশ্বাসকে বুকে আঁকড়ে ধরে। এই বিশ্বাসগুলি পুরুষানুক্রমে প্রচলিত থেকে শেষ পর্যন্ত একদিন সংস্কারের রূপ নেয়। বলা বাহুল্য, এই সংস্কারগুলি

পুরুষের ব্যবধানে সংস্কারের রূপ পরিগ্রহ করে। এই সংস্কার ও বিশ্বাস গুলিই সাধারণ মানুষের জীবনচর্চাকে নানাভাবে নিয়মিত ও নিয়ন্ত্রিত করে। বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি ও আধুনিক মন এগুলি সম্পর্কে যতই অবিশ্বাস ও অবজ্ঞা প্রকাশ ও পোষণ করুন না কেন, সাধারণ মানুষের জীবনে এগুলির প্রভাব অসীম ও অসামান্য। সংস্কার বহু ক্ষেত্রেই মানুষের বোধ ও বুদ্ধির উপরে জয়ী হয়ে থাকে। বিধবা বিবাহ বহু পূর্বেই আইন সংগত হওয়া সত্ত্বেও আজও হিন্দু সমাজের সম্মতি আদায় করতে পারে নি -তার দুর্বোধ্য কারণ এই সমাজ সংস্কারের মধ্যেই পাওয়া যাবে। কবি যেহেতু সাধারণ মানুষ থেকে আলাদা নয়, সুদূর লোকের কোনো জীব নয়, তাই তার মধ্যেও লোকজীবন সম্ভূত সংস্কারের শিকড় প্রোথিত হয় নানা সূত্রে এবং এই সংস্কারই কমবেশি প্রভাবিত করে কবির কাব্য চৈতন্যকে। অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকের অনেক বাঙালি কবিই এ সত্য উপলব্ধি করেছিলেন যে একটি জাতি, গোষ্ঠী বা অঞ্চলের জনজীবন সম্পর্কে জানতে হলে তার লোক সংস্কৃতিই অন্যতম মাধ্যম। তাই তাঁরা শুধু শেকড় সন্ধানী হয়ে লোক ঐতিহ্যের খোঁজে ব্যস্ত থাকেন নি, ফসল ফলাতেও তৎপর হয়েছেন। এই কথাগুলিই দ্বিতীয় অধ্যায়ে 'লোক ঐতিহ্যের প্রেক্ষাপট ঃ প্রধান বৈশিষ্ট্য' শিরোনামে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায় জুড়ে রয়েছে 'বিংশ শতকের অন্ত্যলগ্নের বাংলা কবিতায় কবি-মানস ও লোকমানস' প্রসঙ্গ। উনিশশো সত্তর, আশি ও নব্বই - এই তিন দশকের বাংলা কবিতায় যুগপৎ প্রগতি ও পশ্চাৎ-গতির ছাপ পড়েছে। কবিমানস ও 'লোক' মানস -উভয়ই এর জন্য দায়ী। প্রাচীনপন্থী বিশ্বাস ও আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি একই সঙ্গে ধরা পড়ে এই সময়ের কবিতায়। কবি-মানস কবিতার মধ্য দিয়েই লোক-মানসের সঙ্গে গোপনে কথা বলে। প্রকৃতি, ধর্ম, সভ্যতা ইত্যাদি নিয়ে গুরুগম্ভীর কথা নয়, লোক শরীরের রক্ত ও গায়ের চামড়া ছুঁয়ে দুর্বিষহ কথাবলী। কবিতা যদি শপথ হয়, সে-ও তো লোক-মন নিয়ে। কবিতার ধর্ম বলে যদি কিছু থাকে তবে তা লোক-মানসকে প্রাণিত করা। এর জন্যই কবি-মন শব্দ চয়ন ও বয়ন করে, ছন্দ রচনা করে, স্বরভঙ্গির বিস্তার ঘটায়। এক কথায়, কাব্যের পরিকাঠামো নির্মিত হয় কবির মানস শক্তিতে। কবিতা যেহেতু শিল্পকলা, তাই তার অন্তরালে অনবরতকাজ করে

যায় অলক্ষ্য, অলজ্ঘ্য ও রহস্যময় কবি-মানস। এই কবি মানসের নিকটতম বন্ধু হল লোক-মানস। আলোচ্য অধ্যায় জুড়ে রয়েছে সেই কবি-মানস-ও-লোক মানসের বিশ্বাস-আস্থার নানা কথা।

চতুর্থ অধ্যায়ে 'অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকীয় বাংলা কবিতায় লোকবীক্ষা'র বিষয়টিকে একটা ডিসিপ্লিনে বাঁধার চেষ্টা করেছি। কবিদের যে 'লোকবীক্ষা' সময়ের বিস্তৃততর ক্ষেত্রে –, আলোচনার প্রথাসিদ্ধ পথেই তা এই অধ্যায়ে উপস্থাপিত হয়েছে বলে আমার প্রত্যয়। অনেক স্বপ্ন নিয়ে কবিরা লোক-জীবন পথে পরিক্রমা করতে করতে কি কি লোকোপাদান সংগ্রহ করে কিভাবে সেগুলিকে ধ্বনিতাত্ত্বিক, শব্দতাত্ত্বিক ও বাক্যতত্ত্বের বহুধা বৈশিষ্ট্যে প্রয়োগ করেছেন, লোকসংস্কার, লোকবিশ্বাস, লোকশিল্প, লোকযান, লোকরঙ্গ প্রভৃতিকে কি ভাবে ইঙ্গিতময় শব্দ ও বাক্যে প্রয়োগ করে ভাববস্তুর প্রাসঙ্গিকতা বজায় রেখেছেন, কিভাবে লোক উপাদানের সার্থক ব্যবহারে অনেক কবির কবিতা সৌন্দর্যে দ্যুতিময় ও শিল্পশোভায় ভাস্বর হয়েছে, সে সব বিচার-বিশ্লেষণ করে Hypothesis এর Possible situation গড়ে তোলার প্রয়াস পেয়েছি।

পঞ্চম অধ্যায়ে আছে 'বিংশ শতকের শেষ পাদের বাঙালি কবিগোষ্ঠীর লোক ভাবনা ও মনোগতি'র কথা। এখানে এমন কুড়ি জনেরও বেশি কবির কথা বলা হয়েছে যাঁরা ১৯৭০-এর অনেক আগে থেকেই কবিতা রচনা শুরু করেছেন এবং বিংশ শতকের সাত, আট অথবা নয়ের দশকেও বাংলা কবিতা সৃষ্টিতে যাঁরা ছিলেন উৎকর্ষ প্রতিপাদনে অভ্রান্ত। তাঁরা প্রতিটি দশকেই ছিলেন সাম্প্রতিক অথচ চিরায়ত। রসোপলব্ধির ক্ষেত্রে অথবা দেশ-কালগত জীবন ধারার পটভূমিতে তাঁরা শুধু পূর্বাপর সঙ্গতি রক্ষা করেননি, কাব্যধারাকে সঞ্জীবিত রেখেছিলেন। তাঁদের তাই আলাদা ভাবে স্থান দিতে হয়েছে আলোচ্য অধ্যায়ে। এই সব কবিরা লোক-সংস্কৃতির পক্ষপুটে লালিত মানুষের পক্ষে সদর্থক উপলব্ধি প্রকাশ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে নাগর মনস্কতা ও বুদ্ধি প্রধান্য যেমন ছিল তেমনি ছিল গ্রাম-মানুষের প্রতি মানবিক বোধ ও বোধের মানবিকতা। তাঁদের প্রত্যেকেই কাব্য সৃষ্টির শুরু থেকে অন্ত্যলগ্ন বিশ শতক ও তারও পরবর্তী সময় সীমায় দেশিয় ইতিহাস, লোকায়ত সাহিত্য ও লোক সংস্কৃতির অসংখ্য অনুষঙ্গের ব্যবহারে

আত্মদীপালোক প্রজ্জ্বলিত করেছেন । তাঁরা প্রভাবিত হয়েছেন সবুজ থেকে, গাছের ছায়া থেকে, জল আর আকাশের সীমাহীন রহস্য থেকে, প্রাত্যহিক গ্রাম জীবন, মানুষ এবং তাদের ব্যবহার থেকে । এইসব কবিদের মধ্যে আমি আলোচ্য অধ্যায়ে নির্বাচন করেছি আল মাহমুদ, শঙ্খ ঘোষ, অমিতাভ দাশগুপ্ত, নীরেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, জয় গোস্বামী, অরুণ মিত্র, অলোক রঞ্জন দাশগুপ্ত, তসলিমা নাসরিন, শ্রীজাত, কৃষ্ণা বসু, সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, রত্নেশ্বর হাজরা, অরুণ কুমার চট্টোপাধ্যায়, রাম বসু, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ভূমেন্দ্র গুহ, বিপুল চক্রবর্তী, সুধীর বেরা, শক্তি চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ কবিদের যাঁরা শুধু অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকেই দেদিপ্যমান ছিলেন না, ছিলেন প্রাগান্তলগ্ন বিশ শতকের কবি-সমাজেও ।

'অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকের বাংলা কবিতায় লোকজীবন প্রেক্ষিত' শীর্ষক ষষ্ঠ অধ্যায়ে আছে গ্রাম-বাংলার বৃহত্তর পটভূমিতে ফুটে ওঠা বুনো ফলের মতো প্রাণ ভরিয়ে অবহেলিত বর্গের সাথে, লৌকিক সংস্কৃতির সাথে সেই সব কবিদের যোগ যাঁরা লোকায়ত জগৎকে স্বপ্নে-বাস্তবে, অভিমানে-অনুরাগে প্রত্যক্ষে-পরোক্ষে কবিতার বিষয় বা পটভূমিতে ফুটিয়ে তুলেছিলেন । তাঁদের মধ্য থেকেই আলোচ্য অধ্যায়ে বেছে নেওয়া হয়েছে শামসুর রহমান, বুদ্ধদেব বসু, রমা ঘোষ, মণীন্দ্র গুপ্ত, আবুল বাশার, অমিত চৌধুরী, শতরূপা সান্যাল, কবিরুল ইসলাম, বিনোদ বেরা, রবীন আদক, মিহির বিশ্বাস, বীথি চট্টোপাধ্যায়, সুব্রত রুদ্র, খোন্দকার আশরফ হোসেন, রবীন সুর, পার্থসারথি চৌধুরী, মলয় গোস্বামী, পূর্ণিমা গোস্বামী, সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়, তুষার ভট্টাচার্য প্রমুখ কবিদের যাঁরা বিশ্বাস করেন মৃত্তিকালগ্ন প্রাকৃতজনের প্রাণবন্যাই শুধু পারে একমাঠ ফসলের পৃথিবী সৃষ্টি করতে, পারে মৃত্যুকে হারাতে ।

সপ্তম অধ্যায় হল আলোচ্য গবেষণা গ্রন্থের শেষ অধ্যায় । 'অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকের বাংলা কবিতায় ব্যবহৃত লোকভাষা ও চিত্রকল্প' শীর্ষক এই অধ্যায়ে পূর্বোল্লেখিত কবিদের সঙ্গে আছেন ময়ূখ চৌধুরী, প্রদীপ বসু, রমেন আচার্য, মোহম্মদ রফিক, দাউদ হায়দর, জিয়া হায়দর, আবিদ আনোয়ার, ফররুখ আহমেদ, সানাউল হক, সাযযাদ কাদির, রফিক আহমদ, কাজল চৌধুরী, প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, কবিরুল ইসলাম ।

এই অধ্যায়ের অবতারণা একান্ত জরুরী বলে মনে হওয়ার কারণ, কবিতার ভাব বিচার কায়া বিচারকে বাদ দিয়ে সম্ভব নয়। কবিতার ভাব ও কায়া প্রসঙ্গে যে কথাটি বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার তা হল এই যে একজন কবিকে বুঝতে হলে একটা ঐতিহাসিক কাল ধরে অপেক্ষা করতে হয়, লক্ষ করতে হয় তাঁর ক্রম পরিণতি, বিশ্লেষণ করতে হয় তাঁর কবিতার ভাষা, আঙ্গিক ও রচনা শৈলি, বিচার করতে হয় তাঁর ছন্দ গড়া ও ভাঙার কাজে পরীক্ষা-নিরীক্ষা গুলোকে। আঙ্গিকের আলোচনা ভিন্ন কবিতা-সমালোচনা সম্পূর্ণ হতে পারে না বলেই সপ্তম অধ্যায়ে বিংশ শতকের শেষ তিন দশকের কবিতায় চিত্রকল্পের ব্যবহার, অলংকার প্রয়োগ, শব্দ চয়ন, ছন্দ-ব্যবহার, বাক্য বিন্যাস প্রভৃতি বিষয়ের উপস্থাপনা জরুরী বলে আমার মনে হয়েছে।

জগতের চতুর্থ মাত্রা হল সময়। তার স্নায়ু-স্পন্দন আছে। কোনো দেশে, কোনো ভাষায় কোনো কবি সেটা না বুঝে কবিতা লিখতে পারেন, কিন্তু তা কালোত্তীর্ণ হবে না কখনোই। সময়ের স্বর ও স্বরান্তর ঘটে গাণিতিক হারে, কনটেন্ট বদলায় জ্যামিতিক হারে। সাহিত্যের সব শাখার মতো কবিতারও বিষয় হল মানুষ। এই মানুষকে নিয়েই কবির বয়ান-বাচন ও আত্ম প্রকাশের ধরণ বদলাতে পারে। কবিতার কনটেন্টে নয়, ফর্মেই সময়ের জলছাপ সবচেয়ে হয়ে ওঠে স্পষ্ট। তাই সমাজ-স্বকালকে অস্বীকার করতে পারেন না কোনো কবিই। আমার গবেষণার বিষয়ও সমাজ ও স্বকাল, যেখানে কবিমন বিমূর্ত ব্যঞ্জনায় অবগাহন করে পবিত্র হন। উন্মুখ পাঠকও কবিতার আকর্ষণে সঞ্জীবিত হন।

সীমাহীন অস্বস্তি আর অনুশোচনা নিয়ে স্বীকার করি, আলোচ্য গ্রন্থে নির্বাচিত কবি তালিকায় কোনো কবির প্রতি অবিচার ঘটে যাওয়া অসম্ভব নয়।